ইউনিট ১১

বাংলাদেশের কৃষি

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। অর্থনীতির অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবুও একক খাত হিসেবে কৃষির অবদান এখনও সবচেয়ে বেশি। তাই এই খাতের প্রবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির কারণ ও প্রকৃতি, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি খাতের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে না। এই খাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুধু প্রাথমিক আলোচনা করা হবে।

পাঠ- ১ বাংলাদেশে জনসংখ্যার স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু এখানে কৃসির আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। এজন্য অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি ফসলের একর প্রতিফলন কম। নিচে কৃষির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. **আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার ঃ** উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার করে কৃষির ফলন বাড়ানো যায়। কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তির আশানুরূপ প্রসার ঘটেনি। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির কিছু প্রসার ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে এর প্রসার অত্যন্ত কম বা নেই বললেই চলে।

২. **কৃষি ঋণের অভাব ঃ** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র বলে তাদের নগদ অর্থের অভাব থাকে। কৃষক ঋণ নিয়ে উপকরণ কিনতে পারে। কিন্তু সংগঠিত উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই কৃষকেরা প্রয়োজনীয ঋণ পায় না। এক হিসেবে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক যাদের ০.৫০ একরের কম জমি আছে তারা কৃষি ঋণ পায় না। কৃষক অসংগঠিত উৎস থেকে ঋণ নিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার সুদের হার এত বেশি যে এই সুদে ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন লাভজনক হয় না।

৩. **অপর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ ঃ** আধুনিক প্রযুক্তি অত্যন্ত সংবেদশীল। ঠিক সময়মত সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহর না কররে ফলন খুব কম হয়। অনেক সময় বাজারে সার ও কীটনাশকের অভাব দেখা দেয়। কখনও জ্বালানীর অভাবে সেচের অসুবিধা দেখা দেয়। এসব কারণে কৃষক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত বোধ করে।

৪. **ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা ঃ** বাংরাদেশে কৃষক কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় ত্রুটির জন্য ফসলের যে দাম পায় তাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক সময় পোষায় না। নগদ অর্থের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক ফসল তোলার পর পরই ফসল বিক্রয় করে ফেলে। সে সময় ফসলের দাম কম হয় বলে তারা ভাল দাম পায়না। এছাড়া গুদামঘরের অভাব, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বল।পতার জন্যও তারা ফসলের প্রত্যাশিত দাম পায় না।

৫. **অভাব ঃ** বাংলাদেশের জনগণ অধিকাংশই দরিদ্র বলে তাদের ক্রয়ক্ষতা কম। এজন্য কৃষি পণ্যের চাহিদা আশানুরূপ হারে বাড়ে না। ফলে ফসলের দাম কম হয়।

৬. **কম উৎপাদনশীলতা ঃ** আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। ফলে অনেক ফসলের উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। এসব পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলকভাবে কম দামে পাওয়া যায়। অবাধ আমদানি নীতির ফলে কিংবা প্রায় উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক সীমান্ত হওয়ার ফলে এসব সস্তা পণ্য দেশে আসে এবং প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্য মার খায়।

৭. **পরিবেশগত অবনতি ঃ** বাংরাদেশে নানাবিধ কারণে পরিবেশগত অবনতি ঘটছে। যেমন- অতিরিক্ত হারে গাছপালা কাটা, জলাভূমি চাষের আওতায় আনা, ভারসাম্যহীন সার ব্যবহার, ত্রুটিপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাচ্ছে এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ** বাংলাদেশের কৃষির উপর প্রকৃতির প্রভাব খুব বেশি। যখন প্রকৃতি অনুকূল থাকে তখন কৃষি ফলন ভাল হয়। কিন্তু বন্যা, খরা, কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রভৃতি কারণে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং সার্বিকভাবে কৃষি বিপর্যস্ত হয়।

৯. **উপযুক্ত কৃষি নীতির অভাব ঃ** বাংলাদেশ সরকারের অনুসৃত কৃষি নীতি কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই নীতির কিছু কিছু বিষয় উন্নতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

৭.১.২ বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশের কৃষি নানাবিধ সমস্যার কারণে অনুন্নত। কৃষির উন্নতির জন্য এসব সমস্যা সমাধান করা দরকার। কৃষির এসব সমস্যা দূর করার উপায়সমূহ নিচে আলোচনা করা হলঃ

১. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ঃ** কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমের সার্বিক ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নাহলে কৃষিতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে।

২. **কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ঃ** কৃষির উপকরণসমূহ সময়মত কেনার জন্য কৃষককে সহজ শর্তে ও সরল পদ্ধতিতে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকেরা যাতে ঋণ পায় সে ব্যবস্থা করা দরকার।

৩. **পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ ঃ** বর্তমানে সার, সেচযন্ত্র, জ্বালানী, কীটনাশক ওষুধ, বীজ প্রভৃতি ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এসব উপকরণ যাতে কৃষকেরা সময়মত পায় এবং উপকরণের গুণগত মান ও দাম সঠিক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৪. **বিপণন ব্যবহার উন্নতি ঃ** কৃষক পণ্য বিক্রয় করে যে দাম পায় তা যেন লাভ নিশ্চিত করে সেজন্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার। শস্য গুদামজাত করার জন্য ঋণ দান, দুগামঘর নির্মাণ, মিহাগার নির্মাণ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্রবস্থার দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায়। এছাড়া পণ্যের নতুন ধরনের ব্যবহার প্রবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন নতুন পণ্যটি ভোক্তার রুচিমাফিক হয়।

৫. **ভূমি সংস্কার ঃ** সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

৬. **শস্য বহুমুখীকরণ ঃ** বাংরাদেশের কৃষিতে গুটিকতক পণ্য খুব বেশি গুরুত্ব পায়। ইতিপূর্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ধান ও গম, বিশেষতঃ ধান উৎপাদনে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের জন্য আলু, তৈলবীজ, পাট, ফুল ও লতাপাতা ইত্যাদির চাষ বাড়ানো দরকার।

৭. **টেকসই কৃষি ঃ** কৃষি উৎপাদনের উপর অত্যধিক জোর দেয়ার ফলে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কৃসিতে সার, সেচে ও কীটনাশকের এবং ফসলের প্যাটার্ন এমন হতে হবে যাতে কৃষির টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ** বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি কারণে কৃষির উৎপাদন যাতে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া দরকার। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন ব্যবস্থা এবং শুকনো মওসুমে চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বন্যার ক্ষতি কমানো যায়।

৯. **ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ** কৃষির উন্নয়নের জন্য অকৃষিখাতের উন্নয়ন করা দরকার যাতে কৃষিপণ্য কেনার জন্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০. **কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ঃ** কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাতের এবং বন্যা ও খরা সহনশীল বীজ উদ্ভাবন করা দরকার। কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই জাতের বীজের ব্যবহার এবং টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

১১. **বাণিজ্য ঃ** কৃষিপণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করার দরকার। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দান অবকাঠামো নির্মাণ ও বাজারজাতকরণ সৃবিধা সৃষ্টি করা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি কৃষির সমস্যা নয়-

ক. আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার
খ. ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা
গ. উদ্যোক্তার অভাব
ঘ. পরিবেশগত অবনতি

২। কৃষির উন্নতির জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যায়-

ক. কৃষি ঋণ মওকুফ
খ. বন জঙ্গল কেটে ফেলা
গ. বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ
ঘ. কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের উন্নতি বিধান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. কৃষির চারটি সমস্যা লিখুন।

খ. কৃষির সমস্যা সমাধানের চারটি উপায় লিখুন।

পাঠ- ২ কৃষির আধুনিকীকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- কৃষির আধুনিকীকরণ কাকে বলে বলতে পারবেন;
- কৃষির আধুনীকিকরণের পথে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃষির আধুনিকীকরণ

কৃষি আধুনিকীকরণ বলতে কৃষিতে ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিকাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক উপকরণের দক্ষ ব্যবহার বুঝায়। কৃষির আধুনিকীকরণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তঃ

১. জমি চাষ, পানি সেচ, কীটনাশক প্রয়োগ, ফসল মাড়াই, গুদাম জাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার।
২. উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, সুষম সার ব্যবহার, সেচের দক্ষ ব্যবহার, ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ।
৩. ভূমি সংরক্ষণ ও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি।
৪. সাধারণ ও কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন, উপকরণ ব্যবহার ও বিপণন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি।
৫. কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন।

কৃষির আধুনিকীকরণ সমস্যা

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ গটেছে। সাম্প্রতিককালে আলু উৎপাদনের ক্ষেতেও আধুনিকীকরণ ঘটেছে। কিন্তু অন্যান্য ফসল যেমন- পাট, তেলবীজ, ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তেমন আধুনিকীকরণ ঘটেনি। ধান উৎপাদনের ক্ষেতেও আধুনিকীরণের গতি আশানুরূপ দ্রুত নয়। কৃষি আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা যায়ঃ

১. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা ঃ** বর্ষা মৌসুমে ধান উৎপাদন বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। এ সময় জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে বন্যা বা অতিবৃষ্টির ফলে তার কার্যকারিতা আশানুরূপ হয় না। ফলে এ মৌসুমে আদুনিক কৃষি কম প্রসার লাভ করে।
২. **মূলধন ও ঋণের অভাব ঃ** আধুনিক কৃষি উপকরণ বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করতে হয়। এজন্য যে নগদ অর্থের দরকার অনেক কৃষকের তা থাকেনা। আবার জামিনযোগ্য পরিসম্পদের অভাবে সংগঠিত উৎস থেকে ঋণও নিহে পারে না। ফলে তারা আধুনিক উপকরণ আশানুরূপ মাত্রায় ব্যবহার করতে পারে না।
৩. **কৃষকের জ্ঞানের অভাব ঃ** কৃষকের জ্ঞানের অভাবের জন্য সে সুষমভাবে সার ব্যবহার ও সঠিকভাবে কীটনাশক ব্যবহার করতে পারেনা। এর ফলে জমির পুষ্টি উপাদানের ক্ষতি হয় এবং পরবর্তীকালে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। কৃষক এজন্য আধুনিক উপকরণের ব্যবহারকে দায়ী করে এবং এটি আধুনিকীকরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।
৪. **উপকরণের মূল্য ঃ** বাংলাদেশ সরকার সার, কীটনাশক, সেচ প্রভৃতির উপর তেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ায় এসব উপকরণের বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কেন উপকরণের উপর আমদানি শুল্ক থাকায় তার দাম বেশি পড়ে। ফলে কৃষক উপকরণ ব্যবহারে কিছুটা নিরূৎসহিত হয়।
৫. **উন্নতমানের বীজের অভাব ঃ** কৃষির আধুনিকীকরণের অন্যতম প্রধান উপাদান উন্নত জাতের বীজ। বিদেশের উন্নত জাতের বীজ দেশীয় আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর পর কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে তা কৃষকদের ব্যবহারের জন্য বাজারে ছাড়ে। দুর্বল গবেষণার জন্য বাজারে এরূপ নতুন নতুন বীজের ব্রবহার হচ্ছে না।
৬. **বিপণন সমস্যা ঃ** শস্য সংরক্ষণের অসুবিধার জন্য বা নগদ অর্থের প্রয়োজনে কৃষককে ফসল উঠার পরপরই তা বিক্রয় করে দিতে হয়। ফলে কৃষক ফসলের উৎসাহ ব্যঞ্জক দাম পায় না। কোন বছর অতিরিক্ত ফলনহলে এ সমস্যা আরো তীব্র রূপ নেয়। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতাও বিপণনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।
৭. **সরকারী নীতির দুর্বলতা ঃ** কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য সরকার যে সকল নীতি নেয় তা অনেক সময় সঠিকভাবে বাস্ত বায়িত হয় না, যেমন- খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতি। আবার কোন কোন নীতি আধুনিকীকরণের পথে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে, যেমন- কৃষিযন্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে-

ক. কৃষিতে আধুনিক ব্যবহার বুঝায়
খ. কৃষকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি বুঝায়
গ. বনজঙ্গল কেটে জমি বৃদ্ধি বুঝায়
ঘ. উন্নতমানের দুধ আমদানি করা বুঝায়।

২। কৃষির আধুনিকীকরণের পথে সমস্যা নয় কোনট?

ক. মূলধন ও ঋণের অভাব
খ. কৃষকের জ্ঞানের অভাব
গ. সরকারী নীতির দুর্বলতা
ঘ. দক্ষ শ্রমিকের অভাব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে কি বুঝায়?
খ. কৃষির আধুনিকীকরণের দুটি সমস্যা লিখুন।

পাঠ- ৩ কৃষিজাত পণ্যের বিপণন – সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা

যে ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে সে যে স্থানে, সময়ে ও রূপে চায় সেভাবে পৌঁছে তাকে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা বলে। বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নলিখিত কার্যাদি সংশ্লিষ্ট থাকে : সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, শ্রেণীকরণ, গ্রেডিং ও মোড়ক বাঁধাই, গুদামজাতকরণ ও পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বন্টন, পাইকারী ও খুচরা, অর্থায়ন, ঝুঁকি বহন, বিপণন তথ্য ও গবেষণা।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যভেদে বিপণন সমস্যার কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। তবে সব পণ্যের ক্ষেত্রেই কিছু সাধারণ সমস্যা আছে। এখানে সাধারণ বিপণন সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলঃ

১. **অপ্রতুল বাজার সুবিধা ঃ** কৃষিজাত পণ্য যথাক্রমে গ্রামীণ প্রাথমিক বাজার, সমাবেশ বাজার এবং মাধ্যমিক বাজারে কেনা বেচা হয়। সেব বাজারে বিশেষতঃ গ্রামীন প্রাথমিক বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল। বিক্রেতারা স্থানের অভাবে ভালবাবে লেনদেন করতে পারেনা। তাছাড়া বাজারে টোল ও চাঁদা দিতে হয়। ফলে বিক্রেতার নীট দাম কম হয়।

২. **অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ** কৃষি পণ্যের বিপণনের জন্য সব ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় যেমন- মাথার উপরে করে বহন, গরুরগাড়ী, ভ্যান, ট্রাক, রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি। এর মধ্যে সড়ক পথ ও জলপথে বেশির ভাগ পণ্য পরিবহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান পরিবহণ ব্যবস্থায় পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সময় বেশি লাগে ও খরচ বেশি পড়ে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কৃষি পণ্য পরিবহণে যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

৩. **গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা ঃ** কৃষকের পর্যায়ে অথবা বাজারের পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত খাতে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ ও গুদাম সুবিধার অভাব রয়েছে। এর ফলে শস্য সংরক্ষণ সম্ভব হয় না বা সংরক্ষিত শস্য পোকা, ইঁদুর ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে বেশ কিছু হিমাগার নির্মিত হয়েছে এবং এর ফলে আলু সারা বছর সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. **ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ঃ** বাংলাদেশের সর্বত্র ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ব্যবহার করা হয় এবং কৃষকেরা প্রতারিত হয়।

৫. **বাজার কাঠামো ঃ** সাধারণভাবে দেখা যায় যে কৃষি পণ্যের ব্যক্তিগত বাজার প্রতিযোগিতামূলক। বিভিন্ন পর্যায়ে ছোট ব্যবসায়ী, ফড়িয়া, পাইকার, মিল মালিক, প্রক্রিয়াকারী, যে মুনাফা করে তার হার বেশি নয়। এবং প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল থেকে শহর পর্যন্ত পণ্য পৌঁছাতে কয়েক পর্যায়ের ব্যবসায়ীরই প্রয়োজন হয়। অবশ্য সরকার যেখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে নানারূপ পার্শ্ব লেনদেন দেখা যায়।

৬. **বিপণন ঋণের অভাব ঃ** বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে, যেমন- সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি, অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এরূপ ঋণের ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা খুবই অপ্রতুল।

৭. **বাজার অর্থের অভাব ঃ** কৃষিপণ্যের দামের তথ্য রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু অনেক কৃষক এই তথ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা প্রতিবেশী কৃষক কিংবা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে সাধারণতঃ তথ্য পায়। অবশ্য বড় ব্যবসায়ীরা টেলিফোনের মাধ্যমে অতি সহজে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্যের বাজারে দামের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এর ফলে কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে এবং ভোক্তার প্রদেয় দামও কমে যাবে।

১. **বাজার ও পরিবহণ সুবিধার উন্নয়ন ঃ** গ্রামের প্রাথমিক বাজার, সমাবেশ বাজার ও মাধ্যমিক বাজার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন কৃষক ও ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুসারে করতে হবে। এ বাজারসমূহ পরস্পরের সঙ্গে এবং উৎপাদন এলাকার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য রাস্তাঘাট ও সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। এছাড়া বাজারে যেন বেশি উপশুল্ক বা চাঁদা আদায় না করা হয় এবং ওজন যেন সঠিক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

২. **সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ঃ** সরকার কৃষককে ধান ও গমের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য শস্য কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেকা যায় এর সুফল ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীগণ বেশি ভোগ করেন, কৃষক অল্পই সুবিধা পায়। সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে যে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কেনা উচিত।

   সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে যে সময় গম বিতরণ করে সে সময় দেশে গম কাটা হয়। এর ফলে ঐ সময় গমের বাজারদাম নিচে নেমে যায়। সরকারের উচিত কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ প্রদান অথবা কর্মসূচীর সময় পরিবর্তন করা।

৩. **গুদাম ও ঋণ ঃ** শস্য সংরক্ষণের সময় শস্যের যেন ক্ষতি না হয় এজন্য সরকার গুদামঘর নির্মাণ করতে পারে এবং শস্য গুদামে মজুত রাখার বিপরীতে ঋণ দিতে পারে। সরকারের শস্য গুদগাম ঋণ প্রকল্প এ ব্যাপারে একটি যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ।

৪. **চুক্তিমাফিক উৎপাদন ঃ** বাংলাদেশে তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিমাফিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু আছে। এ ব্যবস্থা অনুসারে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো তালিকাভুক্ত উৎপাদকদেরকে ধারে সব ধরনের উপকরণ ও বিনামূল্যে সম্প্রসারণ সেবা দেয়। উৎপাদক তার ফসল কোম্পানির ক্রয়কেন্দ্রে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করে এবং উপকরণের দাম বাদ দিয়ে যে মূল্য হয় তা পায়। এরূপে চুক্তিমাফিক উৎপাদন অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা যায়।

৫. **কৃষি বিপণন বিভাগ পুনর্গঠন ঃ** কৃষি বিপণন বিভাগ কৃষিপণ্যের দামের তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু জেলাস্তরের নিচে এই বিভাগের কোন কর্মচারী নেই এবং জেলাস্তরের কর্মচারীও স্বল্প বেতনে নন-গেজেটেড কর্মকর্তা। এই কর্মচারীর পদমর্যাদা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার সমান হওয়া উচিত এবং দামসহ দামের বিস্তার, উঠানামা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা?

ক. অপ্রতুল বাজার সুবিধা খ. বিপণন ঋণের অভাব
গ. ক ও খ উভয়ই ঘ. ক ও খ কোনটিই নয়

২। কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানের জন্য নিচের কোন ব্যবস্থাটি নেয়া যেতে পারে?

ক. কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি খ. শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প
গ. কৃষকদেরকে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণদান ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বিপণন সমস্যা লিখুন।

২। বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য বিপণন সমস্যার সমাধানের উপায় লিখুন।

পাঠ- ৪ বাংলাদেশের কৃষিজ ফসল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের খাদ্য শস্যের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের বর্ণনা দিতে পারবেন।

বাংলাদেশের কৃষিজ ফসল ঃ কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশে অসংখ্য প্রকারের কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হয়। এদের কতগুলো খাদ্যশস্য হিসেবে এবং কতগুলো অর্থকরী বা বাণিজ্যিক শস্য হিসেবে বিবেচিত। আবার ব্যবহারের তারতম্য অনুযায়ী কতকগুলো উভয় শ্রেণীভুক্ত হয়। এদেশের কৃষিজ পণ্যগুলোর মধ্যে ধান, দম, পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, সরিষা, তিল, তিসি, তেলবীজ, রবার, রেশম প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া প্রচুর মৌসুমী ফলও বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। যেমন- আম, জাম, নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল, কলা, কমলা, কামরাঙা, তাল, বেল, লেবু, আনারস, তরমুজ, লিচু, আমলকি ইত্যাদি। প্রকৃতি ও ব্যবহারের তারতম্য অনুযায়ী নিম্নে কৃষিজ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলঃ

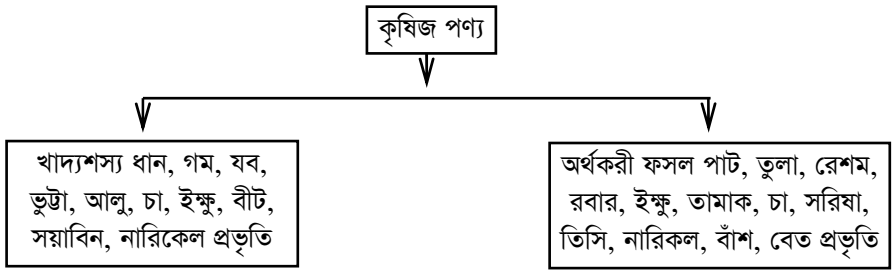

বাংলাদেশের খাদ্যশস্য ঃ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যসমূহ হল ধান, গম, যব, ভুট্টা, বাজরা, আলু, তেলবীজ, ডাল, ফলমূল প্রভৃতি। নিম্নে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলঃ

১. **ধান ঃ** কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য হল ধান। এদেশের উর্বর মৃত্তিকা ও অনুকূল জলবায়ু ধান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তার উপর বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত হওয়ায় ধানের স্থানীয় চাহিদার পরিমাণ খুব বেশি। তাই বাংলাদেশের মোট চাষকৃত জমির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। এদেশে প্রধানতঃ আউশ, আমন, বোরো ও ইরি ও চাস প্রকার ধান উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কম-বেশি ধান উৎপন্ন হয়আর মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, রাজশাহী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বেশির ভাগ ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ছিল প্রায় ২১৮৮৪ হাজার মেঃটন।

২. **গম ঃ** গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে বর্তমানে বাংলাদেশে গম উৎপাদনের উপর বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। এক সময় ধারণা করা হত যে এদেশের মৃত্তিকা ও জলবায়ু গম চাষের অনুকূল নয়। তবে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ঐ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও অমূলক। তাই দেখা যায় ১৯৬৯-৭০ সালে যেখানে বাংলাদেশে গমের উৎপাদন ছিল মাত্র ১.০২ লক্ষ টন, সেখানে ১৯৯৯-২০০০ সালে গমের উৎপাদন এসে দাঁড়ায় ১৭.৫০ লক্ষ মেঃ টনে। এখানকার প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো হল রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, বগুড়া, যশোর ও পাবনা।

৩. **যব ঃ** প্রধানত শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীদের খাদ্য হিসেবে বাংলাদেশে যবের ব্যবহার হয়। প্রধানত রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও বগুড়া অঞ্চলে বেশির ভাগ যবের চাষ হয়। ১০°-১৩° সেঃ উত্তাপ এবং ৪০-৬০ মে. মি. বৃষ্টিপাত যব চাষের জন্য আদর্শস্থানীয়। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে ২১ হাজার একর জমিতে প্রায় ৫ হাজার মে. টন যব উৎপন্ন হয়।

৪. **ভুট্টা ঃ** প্রধানতঃ মানুষের খাদ্য হিসেবেই বাংলাদেশের ভুট্টার ব্যবহার হয়ে থাকে। এর চাষের জন্য ১০০-১৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত এবং ১০°-১৫° সেঃ উত্তাপের প্রয়োজন হয়। এর ফলে বাংলাদেশে ভুট্টার চাষ খুবই কম। ১৯৯৮-৯৯ সালে এদেশে মাত্র ৭ হাজার একর জমিতে ৩ হাজার মে. টন ভুট্টা উৎপন্ন হয়। সমগ্র বাংলাদেশে কম-বেশি ভুট্টা উৎপাদিত হলেও রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বাধিক ভুট্টার চাষ হয়।

৫. **ডাল ঃ** ডাল বাংলাদেশের মানুষের অতি প্রিয় খাদ্য। প্রধানত তরকারি হিসেবে ডালের ব্যবহার করা হয়। তবে বিভিন্ন প্রকারের নাস্তা তৈরিতেও ডালের ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলাদেশের ডাল জাতীয় শস্যগুলোর মধ্যে মুগ, মসুরি, কলাই, খেসারি, বরবটি, ছোলা, মটরশুটি, সীম, অড়হর প্রভৃতি প্রধান। এগুলো রবিশস্যের অন্তর্গত এবং দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। বালি মিশ্রিত দোআঁশ মৃত্তিকায় ডালের চাষ ভাল হয় বলে এদেশের চরাঞ্চল ডাল চাষের জন্য বিখ্যাত। পদ্মা ও যমুনা নদীর অববাহিকার জেলাগুলোতে ডাল অধিক উৎপন্ন হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ ৫১ হাজার একর জমিতে প্রায় ৪ লক্ষ ১৭ হাজার মে. টন ডাল উৎপন্ন হয়।

৬. **তেলবীজ ঃ** বাংলাদেশের একটি রবিশস্য হল তেলবীজ। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার তেলবীজগুলোর মধ্যে সরিষা, রাই, তিল, তিসি, নারিকেল, বাদাম, সয়াবিন ইত্যাদি প্রধান। তার মধ্যে সরিষা, তিল, নারিকেল ও সয়াবিন হতে বাংলাদেশে প্রচুর তেল উৎপাদন হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় তেলবীজ জন্মে। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার মে.টন তেলবীজ উৎপন্ন হয়।

৭. **আলু ঃ** আলু প্রোটিন জাতীয খাদ্য। ভাতের বিকল্প হিসেবে এর ব্যবহার লক্ষণীয়। ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, রাজশাহী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ। বগুড়া, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল প্রবৃতি জেলায় আলুর চাষ হয়। ১৯৯৮-৯৬ সালে সালে বাংলাদেশে মোট ২৭.৬২ মে.টন আলু উৎপাদিত হয়।

৮. **শাক-সবজি ঃ** বাংলাদেশে সারা বছরই বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজির চাষ করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, রাজশাহী, কুমিল্লা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় ৫.৯০ লক্ষ একর জমিতে ১১.৮৭ লক্ষ মে.টন শাক-সবজি উৎপাদিত হয়।

৯. **ফলমূল ঃ** জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ফল জন্মে। এদেশের উৎপাদিত ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠঅল, আনারস, কমলালেবু, কলা, পেঁপে প্রভৃতি প্রধান। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আম উৎপাদনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এছাড়া বৃহত্তর ঢাকার কাঁঠাল, মুন্সীগঞ্জের কলা, সিলেটের আনারস, বরিশালের আমড়া, পটুয়াখালী ও খুলনা জেলার নারিকেল, নোয়াখালীর কচি ডাব অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের প্রায় ২.২ লক্ষ একর জমিতে বার্ষিখ প্রায় ১০ লক্ষ টন ফল উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল ঃ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসলসমূহ হল- পাট, চা, তামাক, তুলা, ইক্ষু, রেশম, রবার প্রভৃতি। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলঃ

১. **পাট ঃ** বাংরাদেশের প্রধান অর্থকরী বা বাণিজ্যিক ফসল পাট। এদেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ১১.৮৪% আয় হয় পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের মোট উৎপন্ন পাটের প্রায় ২৬% এদেশে উৎপন্ন হয়াংলাদেশে পাট চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকায় পাট চাষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বাংলাদেশের রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় সর্বাধিক পাট জন্মে। ১৯৯৮-৯৯ সালে এদেশে ১১.৮১ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৮১.১১ লক্ষ মেট্রিক টন পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট পাটের প্রায় ৫০% বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশ কাঁচাপাট রপ্তানি করে প্রায় ৭.২০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের পাটের প্রধান ক্রেতা।

২. **তুলা ঃ** বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল তুলা। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে তুলা চাষ শুরু হলেও এদেশে তুলা চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তুলা চাষের জন্য মধ্যম বৃষ্টিপাত এবং অধিক উষ্ণতার প্রয়োজন। বাংলাদেশে যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, দিনাজপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় সবচেয়ে বেশি তুলা চাষ হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে এদেশে ১৫ হাজার মেট্রিক টন তুলা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ তুলা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই বাংলাদেশকে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর তুলা আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৮-৯৯ সালে বিশ্ববাজার হতে ২৩.৩০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তুলা আমদানি করে।

৩. **চা ঃ** চা বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে অন্যতম। এটি বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। চা চাষের অনুকূল অবস্থাসমূহ বর্তমান থাকায় বাংলাদেশের সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চা চাষে

সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫৮টি চা বাগান রয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে এদেশে প্রায় ৫৬ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এর প্রায় ৭০% বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে বাংলাদেশ চা রপ্তানি করে প্রায় ৩.৯০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। মুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, রাশিয়া, মিশর, বাংলাদেশী চা-এর প্রধান ক্রেতা।

৪. **তামাক ঃ** তামাক বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। তামাক দ্বারা সিগারেট, চুরুট, বিড়ি, জর্দা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। তামাক উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশের রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, রাজশাহি, কুষ্টিয়া, প্রভৃতি জেলা তামাক উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

৫. **ইক্ষু ঃ** বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষু চিনি উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ছোড়া ইক্ষু থেকে গুড় তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর প্রভৃতি জেলা ইক্ষু চাষে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৯৯৮ সালে এদেশে ৬৯.৫১ হাজার টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়।

৬. **অন্যান্য ফসল ঃ** এছাড়া রেশম, রবার, সুপারি, পান ইত্যাদি বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল।

সমাপনী বক্তব্যে বলা যায়, বাংলাদেশে প্রচুর কৃষিজপণ্য উৎপন্ন হয়আর মধ্যে ধান, দম, আলু, পাট, চা, তামাক, তুলা প্রধান কৃষিজ ফসল বলে বিবেচিত।

সংক্ষেপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কৃষিজ ফসল গুলো কি কি?
২। বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসলগুলি কি কি?
৩। বাংরাদেশের পাটের ভবিষ্যত কি? লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কৃষিজ ফসলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন
২। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যগুলোর বিবরণ দিন।
৩। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসলগুলোর বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৫ বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সেচব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সেচ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সেচ প্রকল্প সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে পানিসেচের গুরুত্ব

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৭৫ জন লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবের কারণে বিভিন্ন ঋতুতে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে। ফলে প্রায়ই শস্যের হানি ঘটে। কাজেই কৃষিজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশে পানি সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব অত্যধিক। সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচব্যবস্থার গুরুত্ব

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এখনো সুষ্ঠু সেচব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তবে বর্তমানে সরকার বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন পেতে হলে সময়মত কৃষিক্ষেত্রে পানি সরবরাহ করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১। **বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার হাত হতে রক্ষা ঃ** বাংলাদেশের কৃষি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সময়মত বৃষ্টিপাত হয় না বলে বা অতি বৃষ্টির ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটে। প্রকৃতির এ অনিশ্চয়তার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে সুষ্ঠু পানি সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২। **একাধিক ফসল উৎপাদন ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ জমি এক ফসলী। এ জমিগুলোতে সুষ্ঠু সেচব্যবআ প্রবর্তন করতে পারলে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদিত হবে। ফলে একদিকে দেশের খাদ্যাভাব দূর করা যাবে এবং অন্যদিকে শিল্পের কাঁচামালেরও সংস্থান হবে।

৩। **শীতকালনি ফসল উৎপাদন ঃ** বাংলাদেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। ফলে এ সময় সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলে শীতকালনি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ফলে খাদ্যসমস্যা দূর হবে।

৪। **চাষের জমি বৃদ্ধি ঃ** সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলে দেশে যে সকল পতিত জমি রয়েছে সেগুলো এবং অনাবাদি জমিগুলোকে ফসল উৎপাদনের অধিনে আনা যাবে। ফলে একদিকে যেমন কৃষিজমি বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

৫। **শস্যের চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ ঃ** একেক ফসলের জন্য একক পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়। যেমন- ধান ও পাট উৎপাদনের জন্য অধিক পানি; গম, আলু ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য কম পানির প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে পানিসেচের মাধ্যমে সঠিক পরিমাণ পানি সরবরাহ করা যায়। ফলে ফসল উৎপাদন ভালো হয়।

৬। **পানি নিষ্কাশনের উপায় ঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাভূমিগুলোতে যে পানি জমাট বেঁধে থাকে সেগুলোকে জলসেচের মাধ্যমে নিষ্কাশন করে সে জায়গায় বোরো ও ইরি ধান চাষ করা যায়। ফলে এ জমিতে অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। এভাবে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

৭। **কৃষির সহায়ক শিল্পের উন্নতি ঃ** পানি সেচব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করা গেলে কৃষিতে পর্যায়ক্রমিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। ফলে কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ; যেমন কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ওষুধ এগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষির সহায়ক উপকরণ শিল্পগুলোরও উৎাদন বৃদ্ধি পাবে এবং এগুলোর উন্নয়ন হবে।

৮। **জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঃ** বাংলাদেশের জাতীয আয়ে কৃষির অবদান প্রায় ৩২%, কৃষিতে যদি সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন সাধন করা যায় তাহলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৯। **ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ** জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে একই জমিতে বার বার ফসল উৎপাদন করা যায়। এতে ভূমির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০।**শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ঃ** সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাতপণ্য অধিক হারে উৎপাদন করা যায়। ফলে কৃষিনির্ভর ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটে।

১১।**বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ঃ** সেচব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়। ফলে কৃষিজাতপণ্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা যায়। এতে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

১২।**বন্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ** পানিসেচের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পানিসেচের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে বন্যার হাত থেকে জমির ফসল এবং জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া যায়।

১৩।**মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ** জল সেচের মাধ্যমে একই ভূমিতে একাধিক ফসল উৎপাদিত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলে কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পায় বলে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে।

১৪।**বেকারসমস্যা সমাধান/কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ** পানি সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। পানিসেচের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে শিল্পকারখানায় অধিক লোক নিয়োগ করা হয়। এতে বেকারসমস্যা অনেকটা দূর হয়।

বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই কৃষিকাজ করা হচ্ছে। পূর্বে কৃষিতে পানির জন্য প্রকৃতির ওপর র্নিভর করতে হতো এবং প্রয়োজনের সময় পানির অভাবের কারণে ফসলহানি ঘটত। বর্তমানে জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয় অর্থাৎ সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে বলে জমিতে ফসল উৎাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের সর্বত্র যাতে সুষ্ঠু সেচব্রবস্থা প্রবর্তন করা যায় এবং এর মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করা যায় এ জন্য সরকারকে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচপদ্ধতি

বাংলাদেশের কৃষি অনেকটা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে হলে ফসল উৎাদন ভালো হয়। আবার সঠিকভাবে বৃষ্টিপাত না হলে ফসল উৎপাদন খারাপ হয়। বর্তমানে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না থেকে কৃষিতে সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সেচব্যবস্থা পূর্বে তেমন উন্নত ছিল না। ফলে অনেক জমি পতিত ও অনাবাদি অবস্থায় পড়ে ছিল। বর্তমানে সরকার বিভিন্ন ধরনের সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে পতিত ও অনাবাদি জমিকে চাষযোগ্য করে তুলেছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচপদ্ধতি

বাংলাদেশে প্রচলিত সেচ ব্রবস্থাগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। সনাতন পদ্ধতি ২। আধুনিক পদ্ধতি।

ক. সনাতন পদ্ধতি (Traditional Methods) ঃ প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে জল সেচ করা হতো সে পদ্ধতিকে সনাতন পদ্ধতি বলে। এখনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে ৪.৯৭ হাজার একর জমিতে সেচ করা হয়।

শ্রেণীবিভাগ ঃ সনাতন পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

১। **দোন পদ্ধতি (Doon System) ঃ** এটি এক ধরনের প্রাচীন সেচপদ্ধতি। কাঠের তৈরি দোন বা ডোঙার সাহায্যে শস্যক্ষেতের নিকটবর্তী নদী, খালবিল, পুকুর, ডোবা ইত্রাদি হতে জল সেচ করা হয়। নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ জেলায় দোন পদ্ধতিতে সেচ কাজ করা হয়।

২। **হেঁইত বা ঝুড়ি পদ্ধতি ঃ** এটাও এক ধরনের সনাতন সেচপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বাঁশ, কাঠ বা টিন দিয়ে তৈরি তিন কোণবিশিষ্ট ঝুড়ি বা হেঁইতের সাথে রশি বেঁধে কৃষিজমির পার্শ্ববর্তী জলাশয় হতে কৃষিকাজে জলসেচ করা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

৩। **কুপ পদ্ধতি ঃ** এ পদ্ধতিতে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে সেচ কাজ করা হয়। যে অঞ্চলে মাটির অল্প নিচে পানি রয়েছে সেখানে অতিসহজেই কূপ খনন করে জমিতে সেচ দেয়া হয়।

৪। **অন্যান্য পদ্ধতি ঃ** উপরিউক্ত সনাতন পদ্ধতিগুলো ছাড়াও ঘটি, বালতি, কলসি, টিন ইত্যাদি দিয়ে পার্শ্ববর্তী ডোবা, পুকর বা নদী থেকে পানি উঠিয়ে কৃষিক্ষেতে পানি সেচ করা হয়। এ পদ্ধতিগুলো বাংলাদেশে এখনও প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

খ. আধুনিক পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রাতি ও সরঞ্জামের সাহায্যে যে সেচকাজ করা হয় তাকে আধুনিক সেচ পদ্ধতি বলে।

শ্রেণীবিভাগ ঃ আদুনিক সেচ পদ্ধতিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যথা-

১। **শক্তিচারিত পাম্প ঃ** বর্তমানে এ পদ্ধতি খুবই প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে নদনদী, খালবিল হতে শক্তিচারিত পাম্প দিয়ে জমিতে পানি দেওয়া হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালে ১৪.০৯ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া হয়।

২। **নলকুপ পদ্ধতি ঃ** বাংলাদেশে তিন ধরনের নলকূপ পদ্ধতি রয়েছে। যেমন (র) হস্তচালিত নলকূপ (রর) গভীর নলকূপ (ররর) অগভীর নলকূপ

(i) হস্তচালিত নলকুপ ঃ ছোট জমিতে এ পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া সহজ। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় এ পদ্ধতিতে পানি সেচ করা হয়। এ নলকূপ স্থাপনের খরচ বেশি নয় বলে এটি সহজেই ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার হস্তচালিত নলকূপ দ্বারা ৬৮ হাজার একর জমিতে পানি সেচ করা হচ্ছে।

(ii) গভীর নলকূপ ঃ যেসব এলাকায় পানির স্তর অনেক নিচে, নদনদী কম সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ বসিয়ে পানি সেচ করা হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ১৯৯৪-'৯৫ সালের প্রায় ৩২,৫০০টি গভীর নলকূপের সাহায্যে প্রায় ১২.৪১ লক্ষ একর জমিতে পানি সেচ করা হচ্ছে।

আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের কৃষি অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতিতে সঠিক সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে ফসল হানি ঘটে। এ ফসল যাতে সঠিকভাবে হতে পারে সে জন্য দেশে সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ সেচব্রবস্থার ফলে অনেক পতিত ও অনাবাদি জমি আবাদযোগ্য হয়েছে। বাংলাদেশে আগে সেচব্যবস্থা উন্নত ছিল না। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সেচপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো দেশের চাষব্যবস্থায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য গৃহতি বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **কর্ণফুলী প্রকল্প ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে ১৯৬২ সালে এ প্রকল্পটি তৈরি করা হয়াঁধটি ৪০ মি. উঁচু, ৬৪০ মি. লম্বা এবং ২৪৪ মিটার চওড়া। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় ১,২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ১০ লক্ষ একর জমিতে পানি সেচ করা হয়। এ প্রকল্পের ফলে ১২১৫ বকিমি এলাকা বণ্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

২। **গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প ঃ** ১৯৫৪ সালে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অনুমোদন লাভ করে। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারার নিকট হার্ডিঞ্জ ব্রিজে এ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়্ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়্ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সেখান থেকে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি পানিপাম্পের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৫১টি জলাশয় মাছ চাষের ইজারা দেওয়া হয়। এখানে প্রথমে ১২৫ ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন পানির পাম্প এবং পরে ১৩০০ ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি পানির পাম্প বসানো হয়েছে।

৩। **গোমতি প্রকল্প ঃ** এ প্রকল্পটি কুমিল্লা জেলার গোমতি নদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৮ হাজার একর জমিতে পানি সেচ দেওয়া হয়।

৪। **চাঁদপুর প্রকল্প ঃ** চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলায় এ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়। চাঁদপুর জেলার প্রায় ১ লক্ষ ৮৭ হাজার একর জমিতে পানিসেচের জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫। **তিস্তা প্রকল্প ঃ** তিস্তা নদীর উপর বাঁধ দিয়ে এ প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সাহায্যে রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার প্রায় ১৩ লক্ষ একর জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করা হয়।

৬। **ব্রহ্মপুত্র বহুমুখী প্রকল্প ঃ** এ প্রকল্প ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্যে অবস্থিত। এ অঞ্চলের প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

৭। **রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা প্রকল্প ঃ** প্রকল্প অনুযায়ী ৩৮০টি নলকূপ ও ৮৬০টি লিফট পাম্পের সাহায্যে মহানন্দা, আত্রাই ও বড়াল নদী হতে পানি উত্তোলন করে রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা অঞ্চলের প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার একর জমিতে সেচকার্য চালানো হয়।

৮। **সাঙ্গু প্রকল্প ঃ** চট্টগ্রাম সাঙ্গু নদীতে বাঁধ দিযে কৃত্রিম হ্রদ নির্মাণের মাধ্যমে এ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়। এ প্রকল্পের সাহায্যে প্রায় এক লাখ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হবে। এখানে বার্ষিখ প্রায় ২০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

৯। **ডিএনডি প্রকল্প ঃ** এ প্রকল্পটি ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এর পূর্বে শীতলক্ষা নদী, দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ শহর, পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা এবং উত্তরে দুলাইখাল অবস্থিত। এ প্রকল্পটি ২০ হাজার একর জমির মধ্যে সেচকার্য এবং ১০ হাজার

একর জমির ফসল বন্যার প্রকোপ হতে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়। এর মধ্যে ১৫ হাজার প্রকর জমি জাষাবাদের উপযোগী।

১০। **দিনাজপুর সেচ প্রকল্প ঃ** দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন নদী হতে পাশ্রে সাহায্যে পানি উত্তোলন করে সেচকার্যের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। **তাঙ্গু প্রকল্প ঃ** দিনাজপুর অঞ্চলের তাঙ্গু ও করতোয়া নদীতে বাঁধ দিয়ে খালের সাহায্যে এ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়। প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে পানি সেচের ব্রবস্থা করা এ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

১২। **কমিল্লা-চট্টগ্রাম প্রকল্প ঃ** এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় এই প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওহায় প্রায় ৭ লাখ একর জমিতে সেচকার্য করা হবে।

চিত্র ১ ঃ বাংলাদেশের সেচপ্রকল্প

১৩। **ফরিদপুর সেচ প্রকল্প ঃ** এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার নদী ও খালগুলোর উন্নয়ন করে পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা হবে। এ প্রকল্পের সাহায্যে ৩ লাখ ৭৫ হাজার একর জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪। **মুন নদী প্রকল্প ঃ** এ প্রকল্পের ফলে মৌলভীবাজার জেলার ৬৫ হাজার একর জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা হবে।

১৫।**বরিশাল-পটুয়াখালী প্রকল্প ঃ** এ প্রকল্প অনুযায়ী বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলার প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার একর জমিতে পানি সেচ করা হবে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬৫ কিমি খাল খনন ও পুন:খনন, ২৬০০টি হালকা পাম্প স্থাপন এবং ৭৫০টি ছোটবড় পুইচগেট নির্মাণ করা হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন এ পরিকল্পনার আওতাধীন রয়েছে।

১৬।**সমুদ্র উপকূলীয় নির্মাণ প্রকল্প ঃ** এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাকে জলোচ্ছ্বাস ও লোনা পানি প্রবেশের হাত হতে রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে প্রায় ৪ হাজার ৮২৭ কিমি বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও ৮০০টি পুইচ গেট বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের ৮০% কাজ শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য সেচব্যবস্থার পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন করা। তাই এ প্রকল।পগুলোকে বহুমুখী প্রকল্প নামকরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অনেক পতিত ও অনাবাদি জমি চাষের আওতাধীন এসেছে। এসব প্রকল্প যদি সঠিকভাবে তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করে তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব কি?
২। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচ পদ্ধতি গুলো কি কি?
৩। বাংলাদেশের সেচ প্রকল্পসমূহের নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অর্থণীতিতে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২। বাংলাদেশের সেচ প্রকল্প সমূহের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৬ বাংলাদেশে বন্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশে বন্যার কারন বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বন্যার কুফল ও সুফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বন্যার সমস্যার সমাধানের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে বন্যার কারণ

বন্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম জাতীয় সমস্যা। প্রতিবছর বন্যার ফলে এ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ঋষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়একটি কোটি টাকার ধনসম্পদ বিনষ্ট হয় এবং মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে। অতিবৃষ্টি, নদ-নদী ও খালের পানিধারণ ক্ষমতা হ্রাস, বনজ সম্পদ হ্রাস, উজানে পানি প্রত্যাহার ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর বন্যা হয়।

বাংলাদেশের বন্যা

কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক পানি প্রবাহ ঘটলে তাকে বন্যা বলা হয়। জাতীয় পর্যায়ে ২০% এর বেশি এলাকা প্লাবিত হয়ে গেলে সেটাকে আমরা বন্যা বলব। গত ২০ বছরে আমাদের দেশে তিনটি বড় ধরনের বন্যা সংঘটিত হওয়ায় বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

সন	বন্যা কবলিত এলাকা (%) শতকরায়	স্থায়িত্ব
১৯৮৭	৩৬%	১/২ সপ্তাহ
১৯৮৮	৬১%	২/৩ সপ্তাহ
১৯৯৮	৬৮%	৭২ দিন

চিত্র ২ ঃ ১৯৯৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহ

বাংলাদেশে বন্যার কারণগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) প্রাকৃতিক কারণ, (খ) সামাজিক/মনুষ্যসৃষ্ট কারণ।

ক. প্রাকৃতিক কারণ ঃ বাংলাদেশে বন্যার প্রাকৃতিক কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **অতিবৃষ্টি ঃ** অতিবৃষ্টি বাংলাদেশের বন্যার অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে নদীনালা, খালবিলের পানি ভরাট হয়ে নদীর তীর উপচে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে। ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

২। **ভূমিরূপ ও গঠনপ্রকৃতি ঃ** বাংলাদেশের ভূমিরূপও বন্যা সৃষ্টির আরেকটি কারণ। বাংলাদেশের কিছু পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়া সমগ্র দেশ সমুদ্র সমতল হতে মাত্র ৮ মিটার উঁচুতে মধ্যে অবস্থিত। সমতল ভূমির ঢাল কম হওয়ায় সহজেই সমুদ্রের পানি সমভূমিতে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে।

৩। **বনজ সম্পদ হ্রাস ঃ** জ্বালালি ও অন্যান্য প্রয়োজনে এ দেশের প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ কেটে ফেলা হচ্ছে। ফলে বন-জঙ্গলের অভাবে বৃষ্টির পানি কোথাও বাধা না পেয়ে সোজা নদীতে চলে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে কোনো এলাকার বনভূমি ঐ এলাকার বৃষ্টির পানির প্রায় ৩০% শোষণ করে নেয়। কিন্তু এ বনভূমি হ্রাস পাওয়ার ফলে বৃষ্টির পানি নদীতে গিয়ে নদী ভরাট করে সমতল ভূমিতে চলে আসে। এভাবে বন্যার সৃষ্টি হয়।

৪। **উজানে পানি প্রত্যাহার ঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর উজানে ফারাক্কাসহ বিভিন্ন ধরনের বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ নদীগুলোতে শুষ্কমৌসুমে পানি প্রত্যাহারের ফলে নদীর স্রোত কমে যায়। ফলে তখন সেখানে পলি জমে নদীর নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। পরবর্তীতে বর্ষামৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নদীতে স্থান না পেয়ে সমভূমিতে চলে আসে এবং বন্যা দেখা দেয়।

৫। **নদীর পানিধারণ-ক্ষমতা হ্রাস ঃ** বাংলাদেশের নদীগুলোর পানিধারণ-ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। ফলে বৃষ্টি পরিমাণ একটু বেশি হলেই অতিরিক্ত পানি নদী ভরাট হয়ে সমভূমিতে চলে যায়। এর ফলে বন্যা দেকা দেয়।

৬। **নিচু ভূমি ঃ** বাংরাদেশের সিলেট ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সমুদ্র সমতলের সমান বা তার চেয়েও নিচে। ফলে বৃষ্টির পরিমাণ একটু বেশি হলেই জলাবদ্ধতার কারণে বন্যা দেখা দেয়।

৭। **বরফগলা পানি ঃ** বাংরাদেশের অধিকাংশ নদী হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ হিমালয় অঞ্চলের বরফগলা পানি বর্ষাকালে বৃষ্টির সাথে মিলে বন্যার সৃষ্টি করে।

৮। **নদীর তলদেশ ভরাট ঃ** পানির স্রোত অনেক সময় পলিমাটি বহন করে আনে। এ পলি মাটি ক্রমে নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়ে নদীর তলদেশ ভরাট করে ফেলে। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে পানি নদীতে সংকুলান না হয়ে উপচে সমভূমিতে চলে আসে এবং বন্যার সৃষ্টি করে।

৯। **আঁকাবাঁকা নদী ঃ** বাংলাদেশের নদীগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঁকাবাঁকা। যখন অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় তখন নদীর পানি বেড়ে যায়। নদীর পানি বৃদ্ধি পেলে তা দ্রুত প্রবাহিত হওয়ার সময় নদীর বাঁকে ধাক্কা লেগে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পানি ফুলে উঠে বন্যার সৃষ্টি করে।

খ. মনুষ্যসৃষ্ট কারণ ঃ নিচে মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো আলোচনা করা হলো-

১। **নদীর গতিপথে বাধা ঃ** মানুষ নদীর উপর দিয়ে চলাচল করার জন্য রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে। এগুলো নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতি বাধা পায়। ফলে উজানে পানির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

২। **খাল ও নালার অভাব ঃ** বাংরাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাল ও নালা নেই বলে বৃষ্টির পানি দ্রুত নদীতে আসতে না পেরে মাঠঘাট ও লোকালয়ে চলে আসে। আবার খাল ও নালার অভাবে নদীতে পানি ভরাট হয়ে উপচে পড়ে সমতল ভূমিতে এসে পড়ে। ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

৩। **অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ রাস্তাঘাট অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পর্যঅপ্ত পরিমাণে পুল ও কালভার্ট নেই বলে অনেক সময় অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি রাস্তার এক পাশ থেকে আরেক পাশে যেতে পারে না, ফলে স্থানে স্থানে বৃষ্টির পানি জমাট বেঁধে বন্যার সৃষ্টি হয়।

৪। **সমুদ্রের নিম্নচাপ ঃ** সমুদ্রে নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং জলোচ্ছ্বাস ঘটে। ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়।

৫। **বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব ঃ** বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের কোনো সুব্যবস্থা নেই, ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে তা কোথাও না যেতে পেরে বন্যার সৃষ্টি হয়।

৬। **গঙ্গা নদীর ফারাক্কা বাঁধ ঃ** বাংলাদেশে বন্যার প্রধান কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কাবাঁধ। ভারত প্রতিবছর শুকনোমৌসুমে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি আটকে দেয় এবং বর্ষার সময় সব গেট একসাথে খুলে দিয়ে বাংলাদেশে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি করে।

অন্যান্য ঃ উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়া আরও কতগুলো কারণে বন্যা দেখা দেয়। যেমন-

১। বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত পশ্চাদ প্রবাহ।
২। ফারাক্কা বাঁধের মধ্যে দিয়ে পানির নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ।
৩। বন্যার অব্যাবহিত পূর্বের ভূকম্পন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশে বন্যা সংঘঠিত হয়বন্যার ফলে ধনসম্পদ, জানমালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই এ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার এবং সরকারকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাশীঘ্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশে বন্যার সুফল ও কুফল

ভূমিকা ঃ বন্যা এক ধরনের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিভিন্ন কারণে উজান থেকে নেমে আসা পানি যথা সময়ে সরতে না পেরে জমাট বেঁধে বন্যার সৃষ্টি করে। এ বন্যা মানুষের মনে আতংকের সৃষ্টি করে। বন্যা আমাদের জন্য শুধু কুফলই বয়ে আনে না বরং কিছু সুফলও বয়ে আনে।

বাংলাদেশে বন্যার প্রভাব

বন্যার খারাপ ও ভালো দুইটি দিকই রয়েছে। নিচে বাংলাদেশে বন্যার প্রভাব আলোচনা করা হলো-

বন্যার কুফলসমূহ

১। **প্রাণহানি ঃ** বন্যার ফলে অসংখ্য মানুষ ও পশুপাখি প্রাণ হারায়। আবার বন্যার পানি কমে যাওয়ার পর বিভিন্ন রোগ জীবাণুর উদ্ভব হয়। এর ফলে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের উদ্ভব হয় এবং অসংখ্যা লোকের প্রাণহানি ঘটে।
২। **ফসল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ঃ** বন্যার সময় জলাবদ্ধতার ফলে প্রচুর ফসল বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া প্রচুর ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট পানির নিচে তলিয়ে যায়। ফলে কোটি কোটি টাকার ফসল ও সম্পদ নষ্ট হয়।
৩। **নদী ভাঙন ঃ** বন্যার কারণে প্রতিবছর নদী ভাঙনের ফলে হাজার হাজার হেক্টর জমি নদগীর তলদেশে নিমজ্জিত হয়।
৪। **রোগের প্রাদুর্ভাব ঃ** বন্যার পানি কমার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ফলে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়।
৫। **যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ঃ** বন্যার পানিতে রাস্তাঘাট সড়কপথ, রেলপথ, ব্রিজ, সেতু ইত্যাদি ডুবে যায়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়।
৬। **দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থার সৃষ্টি ঃ** বন্যার ফলে কোটি কোটি টাকার ফসল ও ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। এর ফলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বন্যাপরবর্তী অবস্থা খুবই করুণ হয়ে পড়ে। এ অবস্থা পরবর্তীতে দুর্ভিক্ষের সূচনা করে।
৭। **শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত ঃ** বন্যার ফলে কৃষিফসল বিনষ্ট হয়। ফলে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর কাঁচামালের অভাব দেখা দেয়। এতে উৎপাদন কমে যায় এবং শিল্পগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৮। **উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঃ** বন্যার ফলে একদিকে কোটি কোটি টাকার ফসল ও সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। আবার বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। এতে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
৯। **নদীর তলদেশ ভরাট ঃ** বন্যার ফলে পলি জমে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যায় ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পায়। বন্যার **সুফলসমূহ ঃ** বন্যার যে কেবল খারাপ দিক রয়েছে তা নয় বরং এর কিছু ভালো দিকও রয়েছে। যেমন-

১। **আবর্জনা পরিষ্কার ঃ** বন্যার ফলে ময়লা আবর্জনা ধুয়ে চলে যায়। ফলে স্থলভাগের আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে পরিবেশ অনেকটা দূষণমুক্ত হয়।
২। **ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঃ** বন্যার পানি নদী হতে যে পলিমাটি নিয়ে আসে তা জমিতে সঞ্চিত হয়এল জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তাই বন্যার পরবর্তী সময়ে ফসল উৎপাদন ভাল হয়।

৩। **মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ঃ** বন্যার ফলে মৎস্যের বিচরণক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। এতে মৎস্যের প্রজনন ও ডিম প্রসবের সুবিধা হয় এবং মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

৪। **সুলভ পরিবহণ ঃ** পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা হচ্ছে নৌপথ। তাই বন্যার সময় অনেক অঞ্চলেই নৌপথে খুব কম মূল্যে যাতায়াত ও পণ্য আনা-নেওয়া করা যায়।

৫। **'জনপথের পরিমাণ বৃদ্ধি ঃ** বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালে নদীগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কারণে নদীপথের পরিমাণ হ্রাস পায়। বন্যার ফলে নদীগুলো অধিক পানি ধরে রাখে বলে জল পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে বন্যার ফলে যেমন মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয় তেমনি নানা ধরনের সুফলও পাওয়া যায়। তবে সুফলের চেয়ে কুফলের পরিমাণই বেশি। তাই বন্যা যাতে আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পানিপ্রবাহকে বন্যা বলা হয়। আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ হলো বন্যার পানিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ। প্রাচীনকাল থেকেই বন্যা সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। এ সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে বন্যা সমস্যার সমাধান

বাংরাদেশে বন্যা সমস্যা দীর্ঘ দিনের। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে ওয়াপদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে ৫৮টি বড় ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচপ্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে ৫১টি প্রকল্প ও ২০ বছর মেয়াদি একটি মহাপরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সুপারিশ করা হয়। ১৯৭২ সালে বিশ্বব্যাংক এ দেশের পানিসম্পদ খাতে সমীক্ষা চালিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ সম্পর্কে মত প্রদান করে। ১৯৮৭-৮৮ এর বন্যার পর দাতাগোষ্ঠী প্যারিসে জি-৭ সম্মেলনে বাংলাদেশে বাৎসরিক বন্যার একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের সুপারিশ করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৮ সালে জাতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার ও ফ্রান্স কর্তৃক বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা জরিপ করা হয়। বিশ্বব্যাংক ১৯৮৯ সালে ৫ বছরের জন্য বন্যা কার্যক্রম নক্সা সংক্ষেপে 'ফ্যাপ' (Flood Action Plan) প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে লন্ডনে দাতা প্রতিনিধিদের সম্মেলনে 'ফ্যাপ' অনুমোদিত হয়। ফ্যাপ অনুমোদনের পর ৫ বছরে ১১টি মূলনীতির ওপর ১৫ ধরনের কাজ করেছে। ফ্যাপ কিছু কাঠামো ও কাঠামোবিহীন প্রকল্প নিয়ে কাজ করেছে। উপরিউক্ত সুপারিশ এবং কাঠামোবিহনি প্রকল্প নিয়ে কাজ করেছে। উপরিউক্ত সুপারিশ এবং কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বন্যা নিম্নোক্ত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে-

১। **নদীর গভীরতা বৃদ্ধি ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর তলদেশের গভীরতা খুবই কম। তলদেশে পলি জমাট বাঁধতে বাঁধতে নদীগুলোর পানিবহণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ নদীগুলোকে ড্রেজার দিয়ে খনন করে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা যায়। এ গভীরতা বৃদ্ধি করলে নদীর পানিধারণ ক্ষমতা বাড়বে এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নদী ভরাট হয়ে সমভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে।

২। **নদীর গতি পরিবর্তন করা ঃ** নদীর গতি পরিবর্তন করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিউসেক পানি যদি মেঘনা নদীতে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার প্রায় ১২ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

৩। **খাল ও নর্দমা কাটা ঃ** বাংলাদেশে বৃষ্টির পানি সরে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাল ও নর্দমা নেই। তাই দ্রুত পানি সরে যাওয়ার জন্য খাল ও নর্দমা কাটা প্রয়োজন। ফলে বন্যা দেখা দিলেও এগুলোর মাধ্যমে পানি দ্রুত অপসারিত হয়ে বন্যার প্রকোপ অনেকটা কমতে পারে।

৪। **নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি না করা ঃ** রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় বৃষ্টি ও নদীর পানির স্বাভাবিক গতি যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। রেলপথ, সড়কপথ নির্মাণের সময় সড়কগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ করলে পানি সড়কের উভয়দিকে চলাচল করতে পারবে। ফলে বন্যার প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পাবে।

৫। **খালের সংস্কার ঃ** বাংরাদেশের সংস্কারের অভাবে অনেক খালই ভরাট হয়ে গেছে। ফলে এগুলোর ওপর দিয়ে পানি চলাচল করতে পারে না। তাই এ খালগুলো সংস্কার করতে পারলে বৃষ্টির পানি সহজেই সরে যেতে পারবে এবং বন্যার প্রকোপ অনেকটা হ্রাস পাবে।

৬। **বাঁধ নির্মাণ ঃ** বাংরাদেশের নদীগুলোর দুই তীরে বড় বড় বাঁধ নির্মাণে পানি নদীর তীর উপচে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। তা ছাড়া সমুদ্র উকূলবর্তী অঞ্চলে ফসলসমূহকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করার

জন্য উপকূলে বাঁধ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এর ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে বন্যা সমর্সা সমাধান করা অনেকটা সম্ভব হবে।

৭। **যৌথ কর্মসূচি ঃ** বাংরাদেশের অধিকাংশ নদী ভারত হয়ে বাংলাদেশের প্রবেশ করেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশকে একা উদ্যোগ নিলেই চলবে না এবং বাংলাদেশের একার পক্ষে তা কার্যকরী করা সম্ভবও নয়। তাই বন্যা সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের সরকারকে যৌথভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়েছে।

৮। **নদী প্রশিক্ষণ ঃ** নদী একটি প্রাকৃতিক উপাদান। প্রতিবছর পলি জমার ফলে নদীগুলো অগভীর হয়ে যায়। সুতরাং নদীগুলোতে ড্রেজিং করলে নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যার তীব্রতা কম হরে।

৯। **প্রোয়িন ঃ** যেসব এলাকা বন্যাপ্রবণ সেখানে সিমেন্ট দিয়ে দেয়ালের মাচা তৈরি করে নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

১০। **বাইপাস ঃ** নদী ঘুরে গেলে পানির গতি কমে যায়। ফলে পানি উপচে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য পানিকে সোজা রাখার জন্য বাইপাস করা হয়। ফলে পানি নতুন পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

১১। **পানি নিষ্কাশন ঃ** পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে বন্যা সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

১২। **অন্যান্য ঃ** উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

১। নদী তীরকে স্থায়ী মজবুত কাঠামো দ্বারা সংরক্ষিত করলে নদীর স্রোত বৃদ্ধি পেয়ে নদীতটে পলি জমাটবদ্ধ হবে।
২। বন্যার পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে।
৩। দেশে অধিকহারে রাডার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
৪। বেড়িবাঁধ ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ করতে হবে ইত্যাদি।

বন্যা বাংলাদেশের একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা উচিত। এ ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশে বন্যা সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বন্যায় প্রাকৃতিক কারনসমূহ কি কি?
২। বাংলাদেশের বন্যায় মানবসৃষ্টি কারনসমূহ কি কি?
৩। বাংলাদেশের বন্যায় কুফলসমূহ কি কি?
৪। বাংলাদেশের বন্যায় সুফলসমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বন্যায় কারনগুলো আলোচনা করুন।
২। বাংলাদেশে বন্যায় কুফল ও সুফলগুলো আলোচনা করুন।
৩। কিভাবে বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রন করা যায়। আলোচনা করুন।